সেই সময় ও হিমালয় দর্শন

কামরুল মান্নান আকাশ

পনেরই আগষ্ট ছিল বাংলাদেশের স্থপতি, স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু দিন। বড় বড় মানুষ যারা উনাকে কাছ থেকে দেখেছেন তারাই তাকে নিয়ে, তার শাসনকাল নিয়ে লিখবেন, বলবেন এটাই রীতি।কিন্তু সধারন মানুষ যারা তাঁকে দূর থেকে কিংবা ক্ষণিকের তরে কাছ থেকে দেখেছে এবং সেই সময়কে দেখেছে তাঁদের ভাবনার প্রকাশের জন্যই এই লেখার আবতারনা। আমিও যে সেই সাধারণেরই একজন। রাজনীতিকে স্পর্শ না করে আমি সেই সময়কে এবং সেই সময়ের কিছু ঘটনার কথা মনে করছি।যদিও রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বকে রাজনীতি এবং সময় থেকে আলাদা করা কঠিন। মনে পড়ছে প্রথম এবং শেষ যেদিন বঙ্গবন্ধুকে দেখি সেদিনের কথা।জীবনের অনেক পথ পাড়ি দিয়ে নানা উত্থান পতন দেখে আমরাও কখন যেন হয়ে গেছি ইতিহাসের অংশ।

উনসত্তুরের গন অভ্যুত্থানের সময়টি ছিল আমাদের বয়সী ছেলেদের জন্য এক বিরাট টার্নিং পয়েন্ট।পড়াশোনা, স্কুল, খেলাধুলা এই সবের মাঝখনে এসে যুক্ত হয় কিছু নতুন বিষয়। আমরা পরিচিত হতে থাকি মিটিং, মিছিল, হরতাল, কারফিউ এইসব নতুন শব্দের সাথে।লাঠি চার্জ, গুলি, গ্রেফতার, ১৪৪ ধারা এসব হয়ে উঠে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যপার। সারা দেশ জুড়েই চলছিল এই অবস্থা। এর মধ্যে ঢাকা, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থাকত সবচাইতে সরগরম এবং উত্তপ্ত। আউটার ষ্টেডিয়াম, বায়তুল মোকাররম এলাকায় রাজনৈতিক দল এবং ছাত্রদের বড় বড় জনসভাগুলি হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন, বটতলা এবং শহিদ মিনারই ছিল সকল আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় আমি ছিলাম নিতান্তই এক বালক। বাবার শিক্ষকতার সূত্রে আমার জন্ম, বেড়ে উঠা এবং শিক্ষা জীবন এই

বিশ্ববিদ্যলয় ক্যাম্পাসকে কেন্দ্র করেই। হয়ত এই পরিবেশে বেড়ে উঠার কারণেই খুব কম বয়সেই রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে সচেতন হয়ে উঠি।

সেই বয়সে ছাত্রদের সাথে আমরাও অনেক মিছিলে গিয়েছি বিভিন্ন রকমের শ্লোগানে গলা মিলিয়েছি। বাঙলীর অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তখন ছিলেন জেলখানায় বন্দী।প্রতিটি মিছিলেই শ্লোগান থাকত 'জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব, শেখ মুজিবের কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে"। উনসত্তুরের গণআন্দোলনের জোয়ারে সরকার বাধ্য হল মিথ্যা আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্তকে মুক্তি দিতে। বাইশে ফেব্রুয়ারি জানতে পারলাম জেল থেকে বেরিয়ে শেখ মুজিব বিকেল তিনটার দিকে শহীদ মিনারে আসবেন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। আমারও খুব ইচ্ছা হতে লাগল শহীদ মিনারে যেতে এবং স্বপ্নের এই নেতাকে দেখতে। সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে সেখানে যাওয়ার।কিন্ত যাকেই বলি সেই বলে অনেক ভীড় হবে ছোটদের ওখানে না যাওয়াই ভাল।খুব রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে আমরা এখন মিছিলে যেতে পারি, টিয়ার গ্যাস ছুড়লে পানিতে ভিজিয়ে নেওয়া রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিজেকে রক্ষা করতে পারি এমন কি লাঠি চার্জ করলে দৌড়ে পালাতেও পারি। তাও নিবে না! যদিও মিছিলে আমাদের দৌড় ছিল ক্যাম্পাসের ভিতরেই সীমাবদ্ধ।

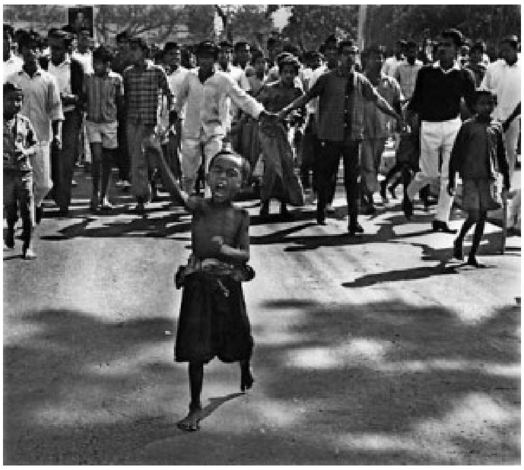

যাই হোক সিদ্ধান্ত নিলাম লুকিয়ে হলেও আমি ওখানে যাব। আজ এত বছর পর মনে করতে পারছিনা আমার সব সময়ের সঙ্গী আমার বড় ভাইও সাথে ছিল কিনা।বিকাল

তিনটার আগেই এসে শহীদ মিনারে বসে আছি, ঠিক বেদীর কাছাকাছি যাতে খুব কাছ থেকে এই মহান নায়ককে দেখতে পারি।আস্তে আস্তে ভীড় বাড়ছে।তখনকার শহীদ মিনারটিতে এখনকার মত এত জায়গা ছিলনা এবং পরিসরটি ছিল খুব ছোট। এর মধ্যে দেখলাম একজন রিকসা করে এসে নামলেন গলায় কাগজের মালা। সাথে সাথে কিছু লোক দৌড়ে গেল সেদিকে "জয় সর্বহারা এবং কমরেড মনি সিং জিন্দাবাদ" শ্লোগান দিয়ে।জানলাম উনি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এবং আজই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এই যে এত লোকজন সবাই তাহলে অপেক্ষা করছে সেই মানুষটির জন্য যিনি বাঙালীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সিপাহশালার!হঠাৎ শোনা গেল তিনি আসছেন। চারিদিক মুহুর্মুহু শ্লোগানে ফেটে পরল। আমি উপর থেকে তাকিয়ে আছি জীবনের প্রথম সেই মানুষটিকে, সেই নেতাকে দেখব বলে। তিনি গাড়ী থেকে বের হলেন দীর্ঘকায় সুপুরুষ, টক টকে গায়ের রঙ আর চোখ পরল মুখের সেই আঁচিলটি – "শত নির্যাতন সয়ে, ভেঙে সেই অন্ধ কারাগার, দৃপ্ত পায়ে নেতা এলেন মাঝে জনতার"। একের পর এক ফুলের মালা দিচ্ছে সবাই তার গলায় আর শ্লোগান উঠছে "জেলের তালা ভেঙ্গেছি শেখ মুজিবকে এনেছি, তোমার আমার ঠিকানা–পদ্মা মেঘণা যমুনা"। আমি সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছি মানুষটির দিকে।তিনি সিঁড়ি ভেঙ্গে এগিয়ে আসছেন মূল বেদীর দিকে, এগিয়ে আসছেন আমার দিকে!কিন্তু হঠাৎ এত মানুষের চাপে মনে হল আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আর পারছিনা দাঁড়িয়ে থাকতে। চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। আমি সেই কিংবদন্তির এতই কাছে ছিলাম যে চিৎকার শুনে তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং মনে হল বললেন আমাকে তুলে নিতে। সাথে সাথে একজন যার হাতে ছিল ইয়াশিকা বক্স ক্যামেরা (কোন পত্রিকার ফটোগ্রাফার হবেন)আমাকে তুলে নেয়। এরপর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম আর শুনছিলাম তার কথা।দেশের মানুষের উপর অত্যাচার আর নির্যাতণের কথা বলতে বলতে তিনি কাঁদছেন আর রুমালে চোখ মুছছেন। আমারও কেমন যেন কান্না পেতে লাগল।মনে হচ্ছিল এই মানুষটির জন্য বোধ হয় আমিও অনেক কিছু করতে পারি যে নাকি এক অজানা বালকের কষ্টের দিকেও দৃষ্টিপাত করেন, দেশের মানুষের জন্য কাঁদেন!

এরপরের সব ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে লাগল। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর, জলোচ্ছাস আর ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে উপকূলীয় অঞ্চলে। পরদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় কালোর পটভূমিকায় প্রধান শিরনামে খবর ছাপা হল আনুমানিক ১০ লক্ষ মানুষ হত। সমস্ত দেশ শোকে মুহ্যমান।বড়রা যখন গলায় গামছা বেঁধে হারমনিয়াম বাজিয়ে “সাহায্য কর গো পুরবাসী” গান গেয়ে পুরানো কাপড় ও সাহায্য সংগ্রহ করছে, আমরাও তাঁদের সাথে গলা মিলিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরছি (ক্যাম্পাসের ভিতরে)। ডিসেম্বরে নির্বাচনের ফলাফলে দেশ তোলপাড়। আওয়ামী লীগ একচেটিয়া বিজয়ী। কেন্দ্রে এবার বাঙালি নেতৃত্বে সরকার গঠিত হবে। এতকাল বাঙালি যে স্বপ্ন দেখেছে, এবার সেই স্বপ্নপূরণ হতে যাচ্ছে।

দেশের রাজনীতি সংঘাতের দিকে মোড় নিচ্ছে। সবার মনেই সংশয় ছিল পাকিস্তানিরা তাদের ২৪ বছরের প্রভুত্ব জনগণের রায় মেনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছেড়ে দেবে কিনা। অচিরেই ওদের মনোভাব নির্লজ্জভাবে প্রকাশিত হতে লাগল, বাঙালিও গর্জে উঠল। শুরু হল দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন।

আবার দেখলাম প্রিয় নেতাকে দূর থেকে ৭ই মার্চের সেই বিশাল জনসভায়।যেখানে তিনি ঘোষনার সুরে আবৃত্তি করলেন শতাব্দির শ্রেষ্ঠ কবিতা, “এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। প্রথম দেখার দিনটিতে যে মানুষটিকে শিশুর মত কাঁদতে দেখেছিলাম তাকেই আবার দেখলাম বজ্রকন্ঠে হুংকার দিতে, শুনলাম তাঁর গর্জন। গণজাগরণের ঢেউ গড়িয়ে চলল স্বাধিকার অর্জনের দিকে।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ নিরস্ত্র মানুষেকে হত্যার মাধ্যমে বর্বর পাকিস্তানীরা যে আক্রমণের সূচনা করে তাঁর উপযুক্ত জবাব দেওয়া চলতে থাকে প্রতি আক্রমণের মাধ্যমে। শুরু হল আরেক অধ্যায় – একাত্তরের মুক্তির সংগ্রাম – প্রতিটি মানুষের, পরিবারের এবং সমগ্র দেশের।

মায়ের অশ্রু, বোনের সম্ভ্রম আর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে নয় মাস রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা।কিন্তু এত আনন্দের মাঝেও নেমে আসে শোকের ছায়া।যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন স্বাধীনতার সেই নেতাই আজ নেই তার স্বাধীন বাংলাদেশে।

আন্তর্জাতিক চাপের মুখে একসময় বাধ্য হয় গনহত্যাকারী পাকিস্তান সরকার আপোষহীন এই নেতাকে মুক্তি দিতে।বঙ্গবন্ধু ফিরে আসছেন এই সংবাদে আবার খুশীর জোয়ারে ভাসল স্বদেশ।বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি ফিরে আসেন গন মানুষের এই নেতা। যিনি মুক্তি যুদ্ধের নয় মাস সশরীরে উপস্থিত না থেকেও নেতৃত্ব দিয়েছেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে চিন্তায় এবং চেতনায়। দেশের মাটিতে নেমে মাটি ছুঁয়ে ডুকরে কেঁদে উঠেন এই সাহসী মানুষটি।হাজারো জনতার ভীড়ে এক কিশোরও সেদিন সাক্ষী হয়ে রইল সেই ইতিহাসের।

কিছুদিনের মধ্যেই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটতে থাকে যা নিয়ন্ত্রনে সরকার ব্যার্থ হয়।মানুষের মনে দেখা দেয় হতাশা যা থেকে জন্ম নেয় ক্ষোভের।অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার গঠন করে রক্ষীবাহিনী।সেই সময় উত্থান ঘটে কিছু সশস্ত্র রাজনৈতিক দলের যাদেরকে দমন করতে যেয়ে রক্ষীবাহিনী নিপীড়ন চালায় নিরীহ মানুষের উপরও। এতে সরকারের ভাবমূর্তি অনেকাংশেই ম্লান হয়ে পড়ে। আমি নিজেও তাঁদের নির্যাতনের শিকার হই, তখন আমি দশম শ্রেণির ছাত্র।আমাদের নরসিংদীর গ্রামের বাড়িতে আমার দাদীকে রেখে ফিরে আসছি। অপেক্ষা করছি হাতিরদিয়া বাজারে বাসের জন্য এমন সময় দেখি রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশের যৌথ কনভয় আসছে ধুলা উড়িয়ে। অনেককেই দেখলাম ভয়ে সামনে থেকে সরে পড়ছে। কনভয় এসে থামল বাজারের মধ্যে। একটু পরেই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা ছড়িয়ে পড়ল। চার পাঁচ

জনের একটি দল বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষারত যাত্রীদের উপর তল্লাসী চালাচ্ছে।দুজন এগিয়ে আসে আমার দিকে জানতে চায় কথেকে এসেছি কোথায় যাব, যা কিনা স্বাভাবিক। কিন্তু হঠাৎ করেই পিছন থেকে আরও দুইজন এসে আমার জুলপি ধরে টানতে থাকে আর বলেতে থাকে এত বড় চুল কেন। প্রতিবাদ করায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে পশ্চাৎদেশে। এরপর আমার ব্যাগে তল্লাসী চালিয়ে বের করে আনে আমার প্রিয় সনি পকেট রেডিও আর হেড ফোন। তখনকার সময়ের গান বা খবর শোনার একমাত্র বহনযোগ্য এই যন্ত্রটি আমার বাবা কানাডা থেকে আমাকে এনে দিয়েছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করে এটা কি, আমি বলি রেডিও। ওরা নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে, বলে না এটা ওয়্যারল্যাস এবং আমি নাকি সর্বহারা পার্টির সদস্য।এই বলে টানতে টানতে নিয়ে চলে তাঁদের ট্রাকের দিকে।মাঝপথে দেখি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন আবদুল হাকিম চাচা যিনি নাকি স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা এবং আমাদের পারবারিক বন্ধু। কেউ হয়ত আমাকে দেখে তাকে খবর দিয়েছিল। উনি আমাকে উদ্ধার করে বাসে তুলে দেন।বাসায় এসে সব বলার পর ছেলের কষ্টে আম্মার চোখ ছল ছল করতে লাগল আর আব্বা খুব রেগে যান। তখুনি ফোন করেন ওয়াহিদুজ্জামান ফুপাকে। ফুপার ভাই ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান তখন ছিলেন রক্ষীবাহিনীর প্রধান(তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলারও আসামী ছিলেন)। আর ফুপা ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদের স্কুল জীবনের বন্ধু। তাঁর পক্ষে কথা বলার জন্যই তাজউদ্দীন আহমদ মুসলিম গভার্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। কিছুক্ষন পর নুরুজ্জামান চাচা ফোন করে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং জানান দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তিনি অবশ্যই ব্যাবস্থা নেবেন এবং নিয়েছিলেন।

আমি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম না কিন্তু রাজনীতি করা কিছু মানুষের সাথে ছিল আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক। ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউনুর রহমান বাবুল ভাই (ভি পি বাবুল) ছিলেন বড় ভাইয়ের মত, খুব কাছের মানুষ।উনি আমাকে প্রায়ই নিয়ে যেতে চাইতেন ছাত্রলীগ অফিসে। বলতেন তোকে কেউ পার্টি করতে বলছেনা, আমার সাথে শুধু চল একদিন। ঢাকা কলেজের উল্টা দিকেই ছিল তখন ছাত্রলীগের অফিস (পরে এটা জনতা ব্যাংক হয়েছিল)।

একতলায় মহানগর আর উপর তলায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়। তো গেলাম একদিন নগর ছাত্রলীগ অফিসে। পরিচয় হল সভাপতি সৈয়দ নুরুল ইসলাম নূরু ভাই, ডাবলু ভাই, রউফ ভাই, ইউনুস ভাই, পিন্টু ভাই, শামিম ভাই সহ আরও অনেকের সাথেই। প্রথম দেখাতেই সাদাসিধা নূরু ভাইকে ভাল লাগল। তিনি কর্মিদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বই পড়তে বলছেন এবং বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করছেন। তাঁদের জ্ঞানের স্তর খুব একটা উন্নত ছিলনা তাতে নূরু ভাই অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন।পরেও দেখেছি বামপন্থি সংগঠনগুলো ছাড়া অন্য সংগঠনগুলোতে জ্ঞান চর্চার অভাব ও অনাগ্রহ।অনেক সাধারন প্রশ্নের উত্তরও কেউ পারছিলনা। একসময় যখন জিজ্ঞাস করলেন ক্রুপস্কয়া কে ছিলেন, আমি আর থাকতে না পেরে বলে উঠলাম লেনিনের স্ত্রী। নূরু ভাই চমৎকৃত হলেন, বললেন তুই কি আগের গুলার উত্তরও জানিস, আমি লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম। এরপর ডেকে নিয়ে তার পাশে বসালেন আর বললেন এখন থেকে সামনে বসবি। সংগঠনের কেউ না হয়েও আমি হয়ে গেলাম তার প্রিয় পাত্র এবং সেই টানেই সেখানে যাওয়া শুরু করলাম।একদিন গিয়ে শুনলাম উনারা যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে। আমাকেও যেতে বললেন, আমি বললাম আমিতো সংগঠনের কেউ না। নুরু ভাই বললেন তুই আমার ছোট ভাই সেই পরিচয়ই যথেষ্ট। আমারও খুব লোভ হল এই বিশাল মানুষটিকে এত কাছ থেকে দেখার, তাই চললাম উনাদের সাথে। ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বর এই বাড়িটির পাশ দিয়ে অনেকবার গিয়েছি কিন্তু কখনো ভিতরে ঢোকার সুযোগ হয়নি।তাই আজ উত্তেজিত।বাড়িতে প্রচুর মানুষের জটলা। গ্রাম থেকে আসা খুব সাধারন মানুষ থেকে শুরু করে নেতা কর্মিরাও সাক্ষাত প্রার্থি, মনে হল কাউকেই নিরাশ করা হচ্ছেনা।কিছুক্ষণ পর ডাক পড়ল আমাদের।নুরু ভাই তো বটেই আরও অনেককে দেখলাম নাম ধরে ডাকতে।শুনেছি উনি নাকি একবার কাউকে দেখলে আজীবন তাকে নামসহ মনে রাখতে পারতেন। আমার দিকে তাকাতেই নুরু ভাই বললেন আমার ছোট ভাই আপনাকে দেখতে এসেছে।মনে হল এরকম অনেকেই উনাকে দেখতে আসে এবং তাতে উনি অভ্যস্থ। স্মিত হেসে পিঠে হাত রাখলেন। তাতেই আমি বর্তে গেলাম। মনে হল আমার হিমালয় দেখা হয়ে গেল।বাইরে বেরিয়ে এসেও আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে থেকে গেলাম। ফিদেল কাস্ত্রো বঙ্গবন্ধুকে দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন “আমি হিমালয়কে দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে

দেখেছি!” সেই হিমালয়ের এত কাছে এসে আমি শিহরিত। দূর থেকে-কাছ থেকে সেটাই শেষ দেখা।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব আর তাতে যোগ দিতে আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। কলাভবনসহ আরো কয়েকটি ভবন ও হল পরিদর্শন করে সমাবর্তনে যোগ দেবেন। ১৪ আগষ্ট ঘুরে ঘুরে দেখছি তার প্রস্তুতি। চারিদিকে প্রাণ চাঞ্চল্য আর কর্মব্যাস্ততা। নতুন সাজে সাজছে ক্যাম্পাস। সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টের সামনে দেখলাম শেখ কামালকে।

পনের তারিখ সকালে যখন ঘুম থেকে উঠেছি তখনো সবাই ঘুমিয়ে শুধু মাত্র আব্বা তার প্রতিদিনকার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। আব্বা এবং অন্য শিক্ষকেরা হাঁটতে যেতেন সোহরাওয়ার্দি উদ্যান হয়ে রমনা পার্কে, আমরাও মাঝ মাঝে যেতাম। সারাদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঠাসা আজকের দিনটিতে কি কি করব তাই ভাবছিলাম। দরজায় কে যেন ঘন ঘন বেল বাজাচ্ছে তাই উঠে এলাম দরজা খুলতে। তাড়াহুড়ো করে আব্বা এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন রাস্তায় কাল পোষাক পরা সেনাবিহিনির লোকজনকে টহল দিতে দেখেছেন এবং পুলিশ কন্ট্রোল রুম ও রেডিও অফিসের সামনে ট্যাংকও রয়েছে। সবাই বলাবলি করছে ওরা নাকি শেখ মুজিবকে মেরে ফেলেছে। আব্বা তাড়াতাড়ি রেডিওটা অন করলেন আমরা সবাই সেখানে যেয়ে বসলাম। আর অমনি ইথারে ভেসে এল মেজর ডালিমের সেই উদ্ধত ঘোষণা। এরপর খন্দকার মোশতাক আহমদের ভাষণ। দেশে সামরিক আইন জারী করা হয়েছে এবং সে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে।সবশেষে বলা হল “বাংলাদেশ জিন্দাবাদ”। বিষন্ন কন্ঠে আব্বা বললেন একি করল ওরা, জিন্দাবাদ শুনে মনে হচ্ছে পাকিস্থানপন্থীরা এর পিছেন আছে। কেমন যেন একধরনের শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ল। ভাবতেও অবাক লাগছিল পাকিস্তানীরা যা করতে সাহস করেনি এই দেশেরই পথভ্রষ্ঠ কিছু লোক অনায়াসে তা করে ফেলল! আরও খবর জানার জন্যে বাসা থেকে বের হলাম। আম্মা বলে দিলেন পাড়ার বাইরে যেন না যাই। আমাদের পাড়ার (ঈসাখান রোড) গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তায় লোকজন কম হলেও কেমন যেন সব স্বাভাবিক, মনে হয় অনেকে কি ঘটে গেছে তা জানেওনা। ফুলার রোড এবং আমাদের পাড়ার গেটে জটলা। জানতে পারলাম কিছুক্ষণ আগে মেজর

ডালিম আর কর্নেল ফারুক এসেছিলেন অধাপক রাজ্জাক সাহেবের বাসায়। ডালিম নাকি তার ভাতিজা হয় সম্পর্কে। জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর শিক্ষক, যাকে উনি পায়ে ধরে সালাম করতেন (চুটকি দাড়ি থাকার কারণে আড়ালে ওনাকে আমরা হোচিমিন দাদু বলে ডাকতাম)। পরে সেই সাক্ষাতের আরও কথা জানতে পারি। দেশের রাজনীতি- অর্থনীতি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল কর্নেল ফারুক। রাজ্জাক সাহেব বলেছিলেন "ছাত্ররা পয়সা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তার সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা করে। তিনি কেন শুধু শুধু বাইরের একজনের সাথে তা নিয়ে আলাপ করবেন। খুব বেশী জ্ঞান পিপাসা থাকলে নিউমার্কেট থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির নোটবই কিনে যেন পড়াশুনা করে(বিপুলা পৃথিবী-অধ্যাপক আনিসুজ্জামান)"।

রেডিওর মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধান, পুলিশ, বি ডি আর, রক্ষীবাহিনী সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল কিংবা করতে বাধ্য হলো। মন্ত্রীসভা গঠিত হলো আগের মন্ত্রী প্রতি মন্ত্রীদের নিয়েই, শুধু থাকলেন না কিছু সিনিয়র মন্ত্রী ও নেতারা। পরদিন অর্থাৎ ১৬ই আগস্ট হেলিকপ্টারে করে বঙ্গবন্ধুর লাশ নিয়ে যাওয়া হয় টুঙ্গিপাড়ায় এবং সেখানেই অতি দ্রুততার সাথে দাফন করা হয়। নিজ গ্রামেই সমাধিস্থ হয়ে রইলেন বাঙালী জাতিয়তার জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্ব ও মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সেদিন তারা কেবল বঙ্গবন্ধুকেই নয়, স্বাধীনতার আদর্শগুলোকেও হত্যা করতে চেয়েছিল।

একদিন রাতের অন্ধকারে বাবুল ভাই আসলেন বললেন উনি নুরু ভাইয়ের সাথে টাঙ্গাইল হয়ে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছেন সাথে শামীম ভাই, পিন্টু ভাই আরও অনেকে। ওখান থেকে এসে যুদ্ধ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বদলা নেবেন। ওনাদের সবার বাড়িই ছিল টাঙ্গাইল। এরপর আর তাঁদের কারোও কোন খবর পাইনি। শুনতাম ময়মনসিংহ সীমান্তে কাদের সিদ্দিকির নেতৃত্ব লড়াই হচ্ছে। ১৯৭৭ সাল হবে হঠাত করে একদিন দেখা হল শামিম ভাইয়ের সাথে(সেই শামীম মোহাম্মদ আফজাল এখন বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এবং ইসালামি ব্যঙ্কের পরিচালক)বললেন বাবুল ভাই মারা

গেছে আর নুরু ভাইকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে কাদের সিদ্দিকির সাথে দ্বন্দের কারণে। উনি আর পিন্টুভাই জেল খেটেছেন আনেকদিন। নূরু ভাই, বাবুল ভাই এমনি ভাবে প্রান দিলেন তার নেতার হত্যার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে। আর তাদের নেতা জীবন দিয়ে গেছেন দেশ আর দেশের মানুষকে ভালবেসে।

ডেভিড ফ্রস্ট যখন বঙ্গবন্ধুকে নিজের 'কোয়ালিফিকেশন'সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আই লাভ মাই পিপল। 'ডিসকোয়ালিফিকেশন' জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'আই লাভ দেম টু মাচ। সত্যিকার অর্থে তিনি বাংলার মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। আওয়ামীলীগের শাসনকাল নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতার জন্য যুগ যুগ ধরে তাঁর লড়াই ও আত্মত্যাগ মিথ্যা হয়ে যাবেনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই নামটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সাথে। মানচিত্রের সাথে। অস্থিত্বের সাথে।